**ওরা চলে গেল**

**ম লা পা**

একদিন দুপুরে প্রায় আড়াইটে-তিনটের সময় গম্ভীর স্বর ভেসে এল। কিছুতেই বুঝতে না পেরে কাজের মেয়ে দীপাকে ডাকলাম, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ, ’ওহ্‌ম’, ‘ওহ্‌ম’ বলে কারা যেন ডাকছে? দীপা কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বলল, ওরা তো কবুতর। দীপা বিহারী, পায়রাকে ওরা কবুতর বলে। ও ভালো করে দেখে বলল, পশ্চিমদিকের জানলার পেছনে যে গ্রীল আছে, তার মাঝখানে যে জায়গাটা, সেখানেই দুটো কবুতর। আপনি সাবধানে আসুন, দেখতে পাবেন। আমি মার্জার গতিতে জানালার কাছে গিয়ে আস্তে করে পর্দা সরিয়ে দেখতে পেলাম, হ্যাঁ, ঠিকই, দুটো পায়রা পরস্পরকে জড়িয়ে বসে আছে।

তারপর প্রতিদিন আমার কাজ হল, ওরা কি করে তা লক্ষ্য করা। সকালবেলাতেই ওরা চলে আসে দুজনে, আমাদের জানলার মাঝখানের জায়গায়। আমি ওদের এই মিলনকেন্দ্রের নাম দিলাম ‘কলি-কুঞ্জ’। ওরা কোথা থেকে খাবার নিয়ে আসে, এ ওর মুখে খাবার গুঁজে দেয় আর আনন্দে ’ওহ্‌ম’, ‘ওহ্‌ম’ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। একটু আধটু উড়ে যায়, আবার ফিরে আসে ‘কলি-কুঞ্জে’। তারপরে ওদের মধ্যে কত কথা, জড়াজড়ি, মিলনও। প্রায় সারাদিন এভাবে কাটায়, সন্ধ্যার আগেই উড়ে যায় ধারে কাছে ওদের বাসায়।

একদিন হল কি, দুপুরবেলায় প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। এদিকেই ঝাপটা, দেখলাম ওরা ডানা মেলে একে অপরকে রক্ষা করছে। মনে হল খুব কষ্ট পাচ্ছে। ওদের অবস্থা দেখে ভাবলাম কিছু করা যায় কিনা। ধীর গতিতে উঠে আস্তে আস্তে জানলার শার্সির কাচটা একটু সরিয়ে বিছানায় বসে দেখতে লাগলাম কি করে ওরা? পায়রা দুটো দেখতে পেল, জানলার একটু ফাঁক, ওর মধ্যে দিয়ে ঘরে ঢুকে প্রাণ বাঁচানো যায়। কিন্তু ওরা ইতস্ততঃ করছে, আরও কোন বিপদের মধ্যে পড়ব না তো? বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে প্রচন্ড ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে পুরুষ পায়রাটা একটু একটু করে শংকিত চিত্তে ঘরের ভেতরে ঢুকল। জানলার সামনেই ছিল আমাদের ওয়াশিং মেশিন, তার ওপর এসে বসল। অন্তরে ভয় শংকা, দেখল কোন বিপদ হল না। স্ত্রী পায়রাটাকেও ডেকে নিল। সেও চলে এল, দুটোয় গুটিসুটি মেরে বসে রইল অনেকক্ষণ, যতক্ষণ ঝড়বৃষ্টি না থামে। আমিও বিছানার একপ্রান্তে সাড়াশব্দ না করে দেখতে লাগলাম ওদের হালচাল। তারপর ঝড়বৃষ্টি কমতে ওরা উড়ে চলে গেল ওদের বাসায়।

পরদিন সকালে যথারীতি কপোতদম্পতি ফিরে এল ‘কলি-কুঞ্জে’। আমি এরপর থেকে জানলার শার্সি খানিকটা খুলে রাখলাম। ওদেরও একটু একটু করে সাহস বাড়তে লাগল। দেখতে লাগলাম ওরা কখনও কখনও একা বা দোকা এসে বসতে লাগল ঘরের মধ্যে ওয়াশিং মেশিনের ওপর। ওরা কিছুক্ষণ বসে, ’ওহ্‌ম’, ‘ওহ্‌ম’ করে, একে অপরকে জড়িয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়। এই ভাবে দিন চলে।

একদিন বিকেলের দিকে ওরা ওয়াশিং মেশিনের ওপর এসে বসল। দুজনে ওরা কথায় মত্ত, কত কি বলছে! আমার হঠাত ইচ্ছে হল, ওদের দুটিকে একটু ধরি। সহজেই ওরা বশ্যতা স্বীকার করল। কোন ছটফটানি নেই, কোন পালাবার চেষ্টা নেই। ওরা হয়ত বুঝতে পেরেছিল যে, এই মানুষটা ওদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি নরম নরম পাখীদুটিকে হাতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। মনে পড়ে গেল, তরুণ বয়সে এই কপোতেরই বার্তা নিয়ে মিছিল করেছিলাম, গান গেয়েছিলাম শ্বেতকপোত আঁকা পতাকা হাতে...। সেই কপোত এখন আমার হাতের মধ্যে। মনে হল, এ আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার। ব্যস্‌, দীপার মাধ্যমে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে বার্তা রটি গেল ক্রমে।

নীচে নামলাম পায়রাদুটিকে নিয়ে। দলে দলে শিশু থেকে তরুণ, গৃহবধূ থেকে প্রবীণ সবাই এসে হাজির পায়রা দেখতে। দেখল, ছোটরা হাতও বোলাল, সবাই বেশ উত্ফুল্ল। ফ্ল্যাটের আপাত নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা খুশীর হাওয়া। কিন্তু আনন্দের মধ্যেও দুঃখ আছে, শংকা আছে, কাঁটা আছে। ভোজনবিলাসী দু-একজন খুদে রাক্ষস পায়রাগুলোকে দেখে রাতে পিকনিকের মতলব আঁটতে লাগল। পায়রার মাংস নাকি অতীব সুস্বাদু। দেখবার ছলে হাতে নিয়ে পায়রাদুটোর ওজন বুঝে আরও পুলকিত। আমি বিপদের আঁচ বুঝতে পারলাম। ওরা কৌশলে বা জোর করে পায়রাদুটোকে নিয়ে নিতে পারে। ওদের অসতর্কতার সুযোগে ‘এই যাঃ, উড়ে গেল’ বলে পায়রাদুটোকে মুক্ত করে দিলাম। কপোতকপোতী উড়ে চলল আকাশে দূরে দূরান্তরে। ভোজনবিলাসী সেই মানুষগুলো হতাশ, আড়ালে আমাকে নিন্দামন্দও করল।

সন্ধ্যা পার হয়ে একটু একটু করে রাত হল। আমি আকাশের দিকে তখন তাকিয়ে চিত্কার করে বললাম, পারিস তো একবার দেখা দিস, আমি যে তোদের বড় ভালোবেসেছি।